Introduction to Emotional Intelligence

1. History of Emotional Intelligence

১৯৮৫ সালে Wayne Leon Payne নামে এক পিএইচডি গবেষক তার ডক্টরেট ডিগ্রির "A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence; Self Integration; Relating to Fear, Pain and Desire" শীর্ষক গবেষণাপত্রে প্রথমবারের মত ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স শব্দটি ব্যবহার করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, সভ্য সমাজে আমরা প্রায়ই আমাদের আবেগকে লুকিয়ে রাখি, যা আমাদের আবেগের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এটি আমাদের আবেগ সংক্রান্ত অজ্ঞতার জন্যও দায়ী।

John Mayer

Peter Salovey

Wayne Leon Payne এর গবেষণা পত্রে শব্দটি প্রথম পাওয়া গেলেও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর জনক ধরা হয় John Mayer ও Peter Salovey'কে। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির Salovey এর গবেষণার বিষয় ছিল আবেগ ও আচরণ আর ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারের Mayer এর গবেষণার বিষয় ছিল আবেগ ও চিন্তার মধ্যকার সম্পর্ক। গ্রীষ্মের এক দিনে এই দুই বন্ধু Salovey'র বাড়ি রঙ করতে করতে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় তাদের মনে হল যে, বুদ্ধিমত্তার কোন সংজ্ঞাতেই আবেগকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু কিছু মানুষ অন্যের আবেগ সহজে বুঝতে পারে ও সে সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অধিক দক্ষতা প্রকাশ করে। তখন তাদের নতুন এক ধরণের বুদ্ধিমত্তার কথা মাথায় আসে যার মূল ভিত্তি হবে প্রতিদিনকার আবেগ অনুভূতিকে সনাক্ত করা, তা সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা। এই চিন্তা থেকেই তারা ১৯৯০ সালে "ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স" নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এখানে তারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর সংজ্ঞায়ন করেন ও এর একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো প্রদান করেন এভাবে,

> "এটি এক প্রকারের সামাজিক বুদ্ধিমত্তা যার মধ্যে নিজের ও অন্যের আবেগ-অনুভূতি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করা, তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা ও এই তথ্য দ্বারা নিজের চিন্তা ও কাজকে পরিচালিত করা অন্তর্ভুক্ত"

Salovey ও Mayer পরবর্তীতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আরো গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যান। তারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স পরিমাপ করার জন্য

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test তৈরি করেন। পরবর্তীতে Salovey এর গবেষণা সহযোগী, অধ্যাপক Marc Brackett, Yale Center for Emotional Intelligence প্রতিষ্ঠা করে এ সংক্রান্ত গবেষণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।

তবে ১৯৯০ সালে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স গবেষণাপত্র প্রকাশ হওয়া মাত্রই কিন্তু এটি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে এত হইচই শুরু হয়নি। বিশ্ব দরবারে এ ধারণা পরিচিত করার পেছনে জড়িত রয়েছে আরেকটি নাম, Daniel Goleman। তিনি নব্বইয়ের দশকে পপুলার সাইকোলজি ও নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার জন্য মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন।

১৯৯২ সালে তিনি মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে একটি বই লেখার জন্য পড়াশোনা করতে গিয়ে Salovey ও Mayer এর গবেষণাপত্রটির সন্ধান পান। তিনি দুই গবেষকের অনুমতি নিয়েই ১৯৯৫ সালে তার “Emotional Intelligence” শীর্ষক বই প্রকাশ করেন। তার বইটি সারা বিশ্বে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। এটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার তালিকায় এক বছর ছিল এবং টাইমস ম্যাগাজিনের কভার পেইজে এটি স্থান পায়। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে বইটির প্রচারণা চালান, অপেরা উইনফ্রের অনুষ্ঠানেও ডাক পান। এভাবে Salovey ও Mayer মূল গবেষণার কাজটি করলেও, Goleman’ই এটিকে সবার সামনে নিয়ে আসেন।

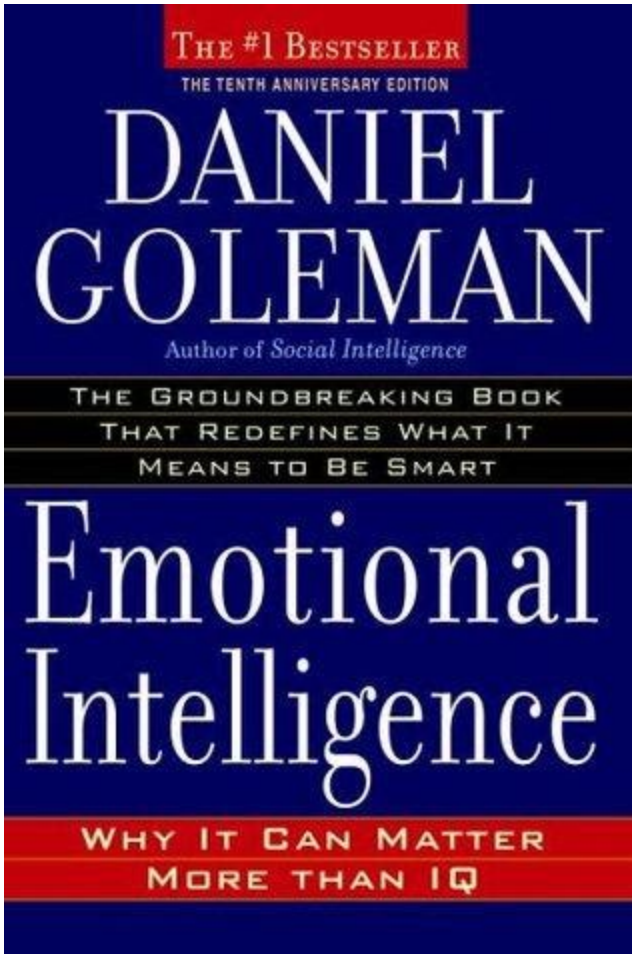

যদিও Mayer পরবর্তীতে বলেছেন যে, Goleman ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর ক্ষেত্রকে এতই বড় করে ফেলেছেন যে তা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বা উপযোগিতা হারিয়েছে। কিন্তু তারপরও Goleman এটি নিয়ে কাজ করে গেছেন এবং ১৯৯৮ সালে তার প্রকাশিত "Working with Emotional Intelligence" বইতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত ২৫ টি দক্ষতা, ক্ষমতা ও পারদর্শিতার কথা বলেছেন।

এরপর আরো অনেক গবেষকই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা ও কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

Resolving The Self-mystery

2. Evolutionary Rational Emotion

Evolutionary psychology হল মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যা বিবর্তন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। বিশেষ করে সেসব আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার উৎপত্তি এবং পরিবর্তন সম্পর্কে বিবর্তনীয় জীববিদ্যা (evolutionary biology) ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়। এর শুরু হয় ১৮৭২ সালে চার্লস ডারউইনের The Expression of the Emotions in Man and Animals বই প্রকাশের মাধ্যমে।

আবেগ একটি সার্বজনীন মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু (universal psychological phenomenon) যা বিবর্তনবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু মানুষ এবং অন্যান্য অনেক প্রাণী, সবাই আবেগ প্রকাশ করে; যেহেতু দেশ-কাল-পরিবেশ ভেদে সব মানুষ কম বেশি একই আবেগ অনুভব করে ও একই ধরণের মুখভঙ্গি (facial expression) দ্বারা আবেগ প্রকাশ করে, তাই ধারণা করা হয়, এটি কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ (common ancestor) থেকে আমাদের মধ্যে এসেছে। শুধু তাই না, ডারউইনের মতে, আবেগ আমাদের বেঁচে থাকা ও বংশ বিস্তারের জন্যও জরুরি এবং ভাষা আবিষ্কারের আগে মুখভঙ্গির মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ যোগাযোগের বড় মাধ্যম ছিল।

ভালোবাসা মানুষকে বা সঙ্গী খুঁজতে ও বংশবিস্তারে সাহায্য করে, ভয় মানুষকে সাবধান হতে ও লড়তে শেখায়, একাত্মবোধ মানুষকে গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্র গড়তে উৎসাহিত করে। অর্থাৎ আবেগ আমাদের অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। আমরা ভয় পেয়েছি বলেই প্রকৃতির সাথে লড়াই করেছি, আমরা ভালোবাসা অনুভব করেছি বলেই নিজের বংশধরদের রক্ষা করতে চেয়েছি।

এভাবে আবেগ আমাদের বিভিন্ন উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে অনুপ্রাণিত করেছে, যা আমাদের সফলতার সাথে টিকে থাকার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুধু তাই না, ভাষা আবিষ্কারের আগে মানুষ অন্যের মুখভঙ্গি দেখে বুঝত অপর ব্যক্তির উদ্দেশ্য কি – বন্ধুত্ব নাকি শত্রুতা। মুখভঙ্গি বিপদের গুরুত্ব বুঝে দ্রুত পদক্ষেপ নিতেও সাহায্য করত। এখন পর্যন্ত, আবেগ প্রকাশের মুখভঙ্গি সার্বজনীন। যে কোন দেশের, ভাষাভাষী মানুষের ছবি দেখেও কিন্তু আমরা তার আবেগ সনাক্ত করতে পারি। তাই বলা

হয়, আবেগ এবং তা বহি:প্রকাশের মুখভঙ্গি সম্পূর্ণ মানবজাতি জীনগতভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে পেয়েছে।

সেজন্যই আবেগকে Evolutionarily Rational বলা হয়েছে।

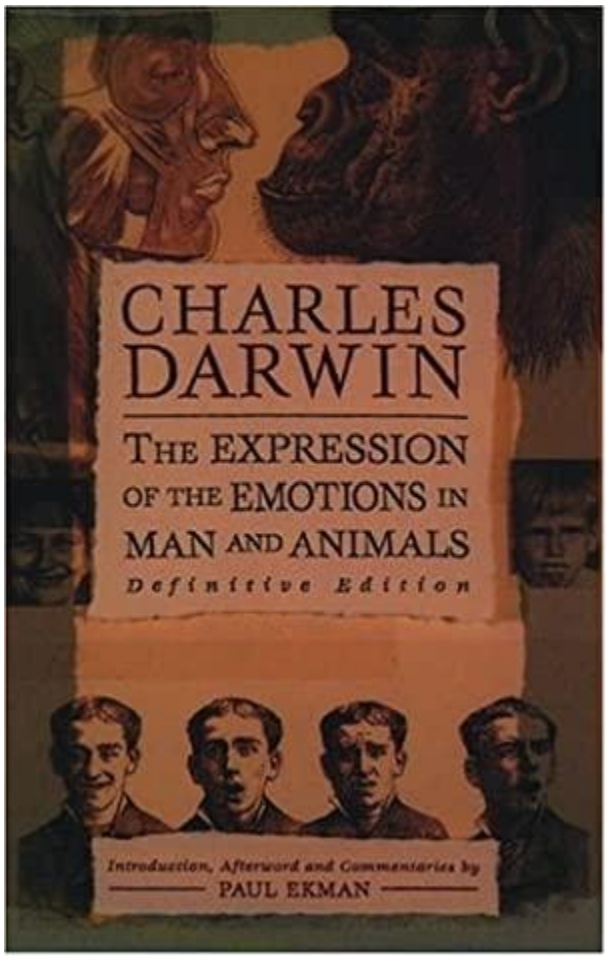

3. Do you know your emotions?

নিজের আবেগ অনুভূতি বুঝতে পারা ও তা গ্রহণ করে নেয়া ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর প্রথম ধাপ। কিন্তু এই প্রথম ধাপটিই অনেকের জন্য খুব কঠিন ধাপে পরিণত হয়ে যায় তার

পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার কারণে। ছোটবেলায় কাঁদতে শুরু করলেই যদি বলা হয়, ‘ছেলেরা কাঁদে না’ কিংবা রেগে গেলে যদি বলা হয়, ‘মেয়ে মানুষের এত রাগ ভাল না’ – তাহলে তাদের পক্ষে বড় হয়ে নিজের রাগ, দু:খ এর মত মৌলিক অনুভূতি সনাক্ত করা বা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা সে ছোটবেলা থেকে সেসব এড়িয়ে যাওয়া বা চেপে রাখার শিক্ষাই পেয়ে এসেছে। এখানে আসলে তার পরিবারেরও দোষ নেই, তারাও হয়ত জানতেন না যে নিজের মানসিক সুস্থতার জন্য, অন্যের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, নিজের অনুভূতি বুঝতে পারা ও তা গ্রহণ করে নেয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আশার বিষয় হল, একটু চেষ্টা করলে ছোটবেলার এ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এরজন্য প্রথমেই যা জানা প্রয়োজন তা হল, আবেগের ভালো-খারাপ বলে কিছু নেই! আমরা অনেকসময় আনন্দ, ভালোবাসা কে ভালো অনুভূতি, আবার রাগ, দু:খ’কে খারাপ অনুভূতি বলে থাকি, বিষয়টা আসলে এমন নয়। সব অনুভূতিই আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন, সব অনুভূতিই আমাদের কোন না কোন শিক্ষা দেয়। তাই এসব অনুভূতিকে নেতিবাচক অনুভূতি ভেবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে, কেন আমি সেটা অনুভব করছি।

যেহেতু আমরা অনেক বছর ধরে এগুলোকে নেতিবাচক অনুভূতি বলে জেনে এসেছি, তাই আমাদের পক্ষে এগুলোকে মেনে নেয়া একটু কঠিন। যেমন, আপনি অনেক পড়ালেখা করে পরীক্ষা দিয়ে আশা করলেন যে, এবার আপনিই সর্বোচ্চ নাম্বার পাবেন, কিন্তু ফলাফলের দিন দেখা গেল যে, অন্য কেউ সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে। এতে আপনার মন খারাপ হতেই পারে, এমনকি হিংসাও লাগতে পারে। হিংসা আসলে রাগ-দু:খেরই একটা মিশ্র রূপ। কিন্তু এমন অবস্থায় আমরা কিন্তু এটা স্বীকার করতে চাই না যে, আমার মন খারাপ হয়েছে বা হিংসা লাগছে। আমরা ভাবি যে, এগুলো খুব খারাপ অনুভূতি, এসব অনুভব করা মানে আমি ভালো মানুষ না ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে প্রকৃত অনুভূতি এড়িয়ে গেলে কিন্তু

আপনার পক্ষে কখনোই সেই অনুভূতির পেছনের কারণ বোঝা বা তা নিরসন করা সম্ভব হবে না।

তাহলে এমন অবস্থায় আপনি কি করতে পারেন? আপনি নিজের অনুভূতি সনাক্ত করুন, গ্রহণ করুন, তার পেছনের কারণটা বোঝার চেষ্টা করুন। ধরে নিলাম, কম নাম্বার পাওয়াতেই আপনার খারাপ লাগছে। এর সমাধান কি? পরেরবার বেশি নাম্বার পাওয়া। কিভাবে তা পাওয়া যায়? এই পরীক্ষায় আপনার প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি ছিল কিনা, উত্তর লেখায় কোন ভুল ছিল কিনা কিংবা উত্তরটা আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যেত কিনা তা ভাবার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে শিক্ষকের সাথে আলাপ করে আপনার কোথায় ভুল হয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে, যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে তার সাথে আলাপ করে জানার চেষ্টা করুন সে কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে বা উত্তর লিখেছে। এভাবে নিজের ঘাটতিগুলো পূরণ করে পরেরবার আরো ভালো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিন, আপনার সর্বোচ্চ নাম্বার পাবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি শুরুতেই খারাপ লাগার অনুভূতিটা অস্বীকার করে পুরো বিষয়টা এড়িয়ে যেতেন, তাহলে আপনার নিজেকে আরো দক্ষ করার সুযোগটিও হারাতেন।

তবে, অনুভূতির পেছনের কারণটা সনাক্ত করার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে, যেন সেটা আপনার নিজের কোন আচরণ বা প্রয়োজন হয়, অন্যের কিছু না। অর্থাৎ, আপনার মন খারাপের কারণ হল আপনি কম নাম্বার পেয়েছেন, আরেকজন কেন বেশি নাম্বার পেল, এটা আপনার বিবেচনার বিষয় না। কারণ, আমাদের পক্ষে শুধু আমাদের নিজেকেই পরিবর্তন করা সম্ভব। আপনার পক্ষে শুধু আপনার নিজের নাম্বারই বৃদ্ধি করা সম্ভব, অন্যের নাম্বার কমানো সম্ভব না। সম্ভব হলেও, সে চেষ্টা করা উচিত না! আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিজের প্রয়োজন পূরণে অবশ্যই সৎ ও বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, যেকোন মূল্যে নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য আপনি অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবেন, এটা উচিত না। আবার, আপনি এক পরীক্ষায় একশতে চল্লিশ পেলেন, এক সপ্তাহ পরেই সেই বিষয়ে একশতে আশি পাবেন, এ ধরণের লক্ষ্য নির্ধারণও না করাই ভালো। নিজের সামর্থ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব বিবেচনা করে ধাপে ধাপে লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কোনো পরিস্থিতিতে নিজের অনুভূতি ও প্রয়োজন সনাক্ত করার একটি ভালো পদ্ধতি হল, সে ঘটনাটা নিয়ে বিস্তারিত লেখা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক James Pennebaker চল্লিশ বছর ধরে অনুভূতি লিখে রাখার সাথে তা প্রক্রিয়াকরণের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার একটি গবেষণা ছিল এমন, ডালাসের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে

একসাথে একশজন ইঞ্জিনিয়ারকে ছাঁটাই করা হয়, যাদের বয়স ছিল পঞ্চাশের উপর এবং তারা ছাত্রজীবন থেকেই ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। এই ছাঁটাইয়ে তারা এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে, চার মাসেও তাদের কেউই নতুন চাকরি খুঁজে পায়নি। তখন Pennebaker তাদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাদেরকে তিন দলে ভাগ করা হয়, যার মধ্যে একদল ছাঁটাইয়ের পুরো প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা, তাদের রাগ, দু:খ, হতাশা নিয়ে লিখবে। আরেকদল এর সাথে কোন সম্পর্কই নেই এমন বিষয় নিয়ে লিখবে, যেমন, সময়ানুবর্তীতা। আরেকদল কিছুই লিখবে না। লেখা শুরু করার আগে ছাঁটাই নিয়ে মনোভাব বা নতুন চাকরি খোঁজার চেষ্টায় সেই একশজনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু লেখা শুরু করার পরেই তাদের মধ্যে চোখে পরার মত পার্থক্য দেখা যায়। গবেষণা শুরু হবার মাসখানেক পরেই যে দল তাদের ছাঁটাইয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিল, তাদের পুনরায় চাকরি পাবার হার অন্য দুই দলের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই না, ছাঁটাইয়ের পর তাদের জীবনে যে হতাশা, নির্জীবতা নেমে এসেছিল, সেটাও তারা কাটিয়ে উঠতে অনেকাংশে সফল হয়।

বিভিন্ন বয়সের, পেশার কয়েক হাজার মানুষের উপর এমন অনেক গবেষণা করা হয়। কেউ তাদের অভিজ্ঞতা কাগজে কলমে লিখেছে, কেউ কম্পিউটারে, কেউ আবার না লিখে একটানা কথা বলে সেটাকে রেকর্ড করেছে। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, সবক্ষেত্রে একই ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।

এর কারণ কি? কারণ হল, কোন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে গেলে আমরা সেটাকে নানান আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করি, সেখানে আমাদের ভূমিকা, অপর পক্ষের ভূমিকা বোঝার চেষ্টা করি। নিজেদের কোন ভুল-ত্রুটি ছিল কিনা, কোনো ঘটনা অন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে আরও ভালোভাবে সামলানো যেত, এসব নিয়ে ভাবি। এভাবে আমরা এমন অনেককিছু উপলব্ধি করি, যা নিয়ে আগে কখনো ভাবিনি। গবেষণাতেও দেখা গেছে যে, অনেকেই লিখতে লিখতে এমন লিখেছেন- "আমি আজকে বুঝতে পারলাম যে", "যে কারণে এমন হয়েছে তা হল", "আমি এখন পুরো বিষয়টা সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করতে পেরেছি"। এসব উপলব্ধি দ্বারা ওই ঘটনাকে আমরা নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শিখি, যা সেই পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করে।

James Pennebaker এর মতে, নিজের অনুভূতি নিয়ে লেখার জন্য দিনে মাত্র বিশ মিনিট সময় দেয়াই যথেষ্ট। লেখার সময় বানান, ভাষা, হাতের লেখা বা দাঁড়ি-কমা নিয়েও বেশি চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন নেই। এই লেখা কেউ পড়বে না, এমনকি আপনি নিজেও হয়ত দ্বিতীয়বার এই লেখা পড়বেন না। শুধু নিজের যা মনে হয়, ভালো খারাপ যাই হোক, তা লিখে যান। আপনার মনই আপনাকে এক্ষেত্রে পথ দেখাবে।

4. Self Awareness Checklist

নিচের প্রশ্নগুলো কোনো পরিস্থিতিতে আপনার অনুভূতি ও তার পেছনের কারণ বা প্রয়োজন বুঝতে আপনাকে সাহায্য করবে।

- আপনার কেমন লাগছে? রাগ লাগছে? সব ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে? মনে হচ্ছে কেউ আপনার সাথে অন্যায় করেছে? মন খারাপ লাগছে? নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে? সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন?ভয় লাগছে? মনে হচ্ছে কোন বিপদ হতে পারে? সেই পরিস্থিতি থেকে দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করছে? অপরাধবোধে ভুগছেন? মনে হচ্ছে ভুল করে ফেলেছেন? এমন করাটা উচিত হয়নি? লজ্জা পাচ্ছেন? মনে হচ্ছে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি? সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন?
- কবে থেকে বা কখন থেকে এমন অনুভব করছেন?

(যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট সময় বা পরিস্থিতি মনে করার চেষ্টা করুন)

- সেদিন কি বিশেষ কিছু ঘটেছিল কিংবা সেদিনের পর থেকে অন্যরকম কিছু ঘটছে? কোনো পরিস্থিতি কিংবা কারো আচরণে পরিবর্তন ঘটেছে কি?
- সে ঘটনার ফলে আপনার কোন প্রয়োজনের অভাববোধ হচ্ছে বা কোন প্রয়োজনটি সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে না?

(প্রয়োজনটি যথাসম্ভব নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার চেষ্টা করুন)****

- নিরাপত্তা, সন্তুষ্টি, আত্মসম্মান, সামাজিক স্বীকৃতি, পারস্পারিক সম্পর্ক, শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শান্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভালোবাসা, সততা, সম অধিকার, আশা, একতা কিংবা অন্যকিছু?
- এই প্রয়োজন পূরণে আপনার পক্ষে কি কি করা সম্ভব?

ভুল শোধরানো কিংবা ক্ষমা চাওয়া, যে অন্যায় করেছে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করা বা তার শাস্তির ব্যবস্থা করা, বাসার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা বা সেল্ফ ডিফেন্স ক্লাসে ভর্তি হওয়া, মন খারাপের কথাগুলো কারো সাথে খুলে বলা কিংবা অন্য কিভাবে অন্যায় না করে, নিজের কিংবা অন্য কারো ক্ষতি না করে প্রয়োজনটি পূরণ করা সম্ভব তা বের করার চেষ্টা করুন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন।

- ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে না হয় সেজন্য কি করা যায়?

আপনার ইতিবাচক গুণাবলী, যোগ্যতা, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা যায় তা চেষ্টা করুন।

Mindset Intervention

5. Growth Mindset: how to change your brain?

Carol Dweck মানুষের মোটিভেশন বা প্রেরণা সংক্রান্ত গবেষণার একজন পথিকৃৎ। যুক্তরাষ্ট্রের কলোম্বিয়া ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে বর্তমানে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে “ব্যর্থতা”র প্রতি তার ছাত্রছাত্রীদের আচরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন।

তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছু শিক্ষার্থী যেখানে অনেক বড় কোন কাজে বিফল হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে আবার চেষ্টা করে, সেখানে কিছু শিক্ষার্থী আবার সামান্য বাঁধার সম্মুখীন হলেই হাল ছেড়ে দেয়।

হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এমন আচরণ নিয়ে গবেষণা করে তিনি ২০০৬ সালে প্রকাশিত **Mindset: The New Psychology of Success** বইতে কোন সমস্যা বা ঘটনাকে দেখার দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি বা মাইন্ডসেট – ফিক্সড ও গ্রোথ মাইন্ডসেটের কথা বলেছেন।

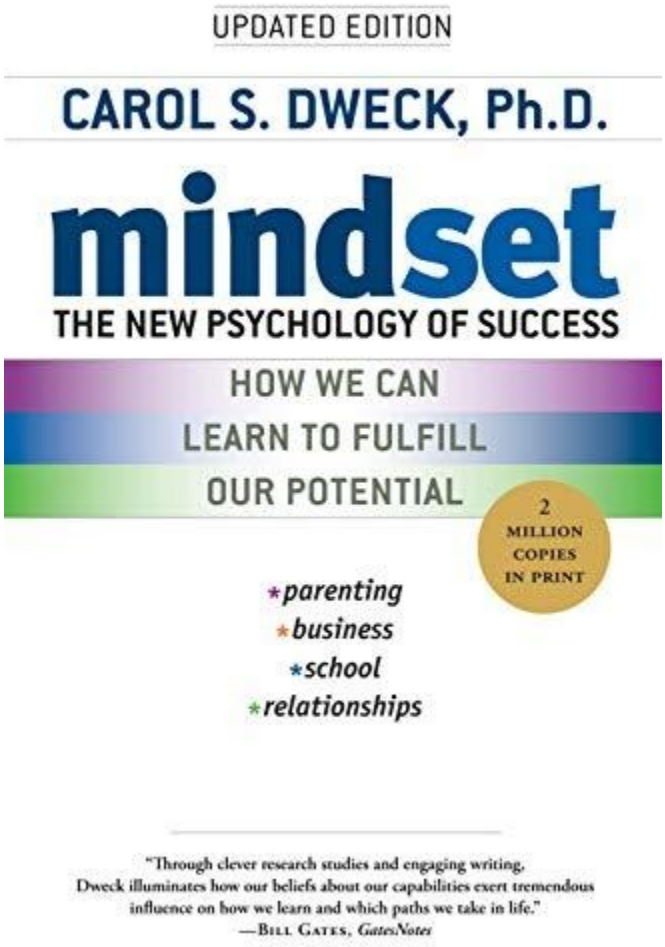

যারা মনে করে যে, বুদ্ধিমত্তা, মেধা, দক্ষতা এসব মানুষ জন্মগতভাবে অর্জন করে, কেউ কোন কাজে খুব দক্ষ কারণ “he/she was born that way”, তারা ফিক্সড মাইন্ডসেটের অধিকারী। আর যারা মনে করে যে, বুদ্ধিমত্তা, মেধা এগুলো তরল পদার্থের মত পরিবর্তনশীল, চেষ্টা দ্বারা এগুলোর উন্নতি করা সম্ভব, তাদের মাইন্ডসেট কে বলা

যায় গ্রোথ মাইন্ডসেট। আর মানুষ তার জীবনের কঠিন পরিস্থিতি, জটিলতা, বাঁধা এসব কিভাবে সামলাবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে এই মাইন্ডসেটের উপর।

গ্রোথ মাইন্ডসেট আমাদের সফলতার চেয়ে কাজের প্রক্রিয়া, পরিশ্রম বা চেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব দিতে উৎসাহ দেয়। কোন একটা কাজে মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করার পরও যদি আমরা বিফল হই, তাহলে কি আমাদের সব পরিশ্রমও ব্যর্থ হয়ে যাবে? কখনোই না। কোন কাজে অংশগ্রহণ করলে, সেটা করার চেষ্টা করলেই কিন্তু অনেক কিছু শেখা হয়, জানা হয়। আর সে অভিজ্ঞতার মূল্য সফলতার চেয়ে কম নয়।

মাত্র সাড়ে তিন-চার বছর বয়স থেকেই কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মাইন্ডসেট গঠন হওয়া শুরু করে। আর এর পিছনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের আচরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তারা যদি শিশুর কাজের সফলতার, বুদ্ধিমত্তার উপর জোর না দিয়ে শিশুর চেষ্টা, পরিশ্রমের প্রশংসা করে, তাহলে তার মধ্যে গ্রোথ মাইন্ডসেট গড়ে উঠবে। তবে কতটুকু কাজের জন্য কি ধরণের প্রশংসা করা হচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। কারণ, যদি শিশুর সামান্য চেষ্টাতেই সে অনেক পরিশ্রম করেছে এ ধরণের কিছু বলা হয়, তাহলে শিশু খুশি হবার পরিবর্তে উলটো তার মনে হতে পারে যে, এরচেয়ে বেশি ভালো করা তার পক্ষে সম্ভব না কিংবা প্রশংসাটা আসলে তার প্রতি সান্ত্বনা পুরষ্কার। ঠিকমত না বুঝেই গ্রোথ মাইন্ডসেটের এমন ঢালাও ব্যবহারকে Carol Dweck বলেছেন “False Growth Mindset”।

তবে ছোটবেলায় যদি কেউ অন্যের ফিক্সড মাইন্ডসেট বা ফলস গ্রোথ মাইন্ডসেট দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকে, তাতেও চিন্তার কোন কারণ নেই, পরবর্তী জীবনেও মাইন্ডসেটের পরিবর্তন করা সম্ভব। কারণ আমাদের ব্রেইন আসলে সারাজীবনই নতুন নিউরাল কানেকশন তৈরি করতে পারে যাকে নিউরোপ্লাস্টিসিটি বা ব্রেন প্লাস্টিসিটি বলা হয়। আর এ কানেকশন কিন্তু আমাদের চিন্তাভাবনা বা মানসিক অভিজ্ঞতার ফলেই তৈরি হয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা, কৌশল এসবে পরিবর্তন আনলে তা আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনের মাঝেও নতুন সংযোগ তৈরি করবে, যা আমাদের কাজকর্মে প্রভাব ফেলবে।

6. The Father of Stress Research

১৯০৭ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় Hans Selye এর জন্ম। তিনি জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালিতে পড়ালেখা করে ১৯৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে

গবেষক হিসেবে কাজ করার জন্য। পরের বছর তিনি কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং সেখানেই স্ট্রেস নিয়ে তার বিখ্যাত গবেষণাটি করেন।

Image Credit: Shutterstock

১৯৩৪ সালে যখন তিনি ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগে কর্মরত, তখন নতুন হরমোন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ইঁদুর নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেন। প্রথমে তিনি

ইঞ্জেকশনের সাহায্যে তাদের ডিম্বাশয়ের নির্যাস প্রদান করেন, যার ফলে ইঁদুরদের মধ্যে এ্যাড্রেনাল কর্টেক্স বড় হয়ে যাওয়া, থাইমাস, প্লীহা ও লসিকাগ্রন্থি ক্ষয় হয়ে যাওয়া, পাকস্থলীতে রক্তপাত ও আলসার হওয়ার মত নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি এই ভেবে খুশি হন যে, নিশ্চয় নতুন কোন হরমোনের ফলে এমন হচ্ছে যা তিনি আবিষ্কার করতে পারলে সকলের মাঝে সাড়া পড়ে যাবে। কিন্তু তার এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না কারণ প্লাসেন্টা ও পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস প্রদানের পরেও ইঁদুরদের মধ্যে ওই একই ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরপর তিনি বৃক্ক, প্লীহা থেকে শুরু করে ইঁদুরের নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ইঞ্জেকশন প্রদান করেন, যার সবগুলোই একই ফলাফল প্রর্দশন করে। সবশেষে তিনি ফরমালিনের মত বিষাক্ত পর্দাথ ব্যবহার করেন, আশ্চর্যজনকভাবে সেটাও শারীরিক নির্যাস প্রদানের মত লক্ষণই প্রকাশ করে। এ পরীক্ষা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, আসলে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তিনি যা প্রদান করছেন শুধু তার ফলে এমন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না, বরং গবেষণাগারে আটকে রেখে নানা পরীক্ষা চালানোর ফলে ইঁদুরগুলো যে চাপের মধ্যে আছে, মূলত সে কারণেই তারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে।

Hans Selye বলেন যে, লম্বা সময় ধরে আমরা যদি অতিরিক্ত স্ট্রেসের মধ্যে থাকি, তাহলে তা General Adaptation Syndrome (GAS) এ পরিণত হবে, যা পরবর্তীতে নানান অসুস্থতার সূচনা করবে। GAS এ তিনটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপ (Alarm Phase) হল স্ট্রেসে পড়লে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেয়ে, কর্টিসল নিসৃত হয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের শরীর যে প্রতিক্রিয়া দেখায়। প্রাথমিক ধাক্কা চলে যাওয়ার পর আমাদের শরীর কিছুক্ষণ সতর্ক অবস্থায় থাকলেও রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসা শুরু করে। এটি হল দ্বিতীয় ধাপ (Resistance Phase)। যদি এরমধ্যে পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাহলে শরীরে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যদি আমরা ক্রমাগত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই থাকি, তাহলে আমাদের অজান্তেই শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন আসতে থাকে। আমাদের হরমোনের পরিমাণ, রক্তচাপ এসব এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যার ফলে আমরা সহজেই বিরক্ত হই, কিছুতে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয় এবং এক সময় হতাশ হয়ে যাই, যা তৃতীয় ধাপের (Exhaustion Phase) সূচনা করে। লম্বা সময় ধরে শরীর স্ট্রেসের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে যায়, আমরা নির্জীব, অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাই, সহ্যক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যা অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। দুই বিশ্বযুদ্ধেই সৈন্যদের মাঝে লম্বা সময় ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার পর এই ধরণের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা যায়, শুধু সৈন্য না, যেকোন মানুষই প্রতিকূল অবস্থায় টানা অনেকদিন থাকলে তার এমন সমস্যা হতে পারে।

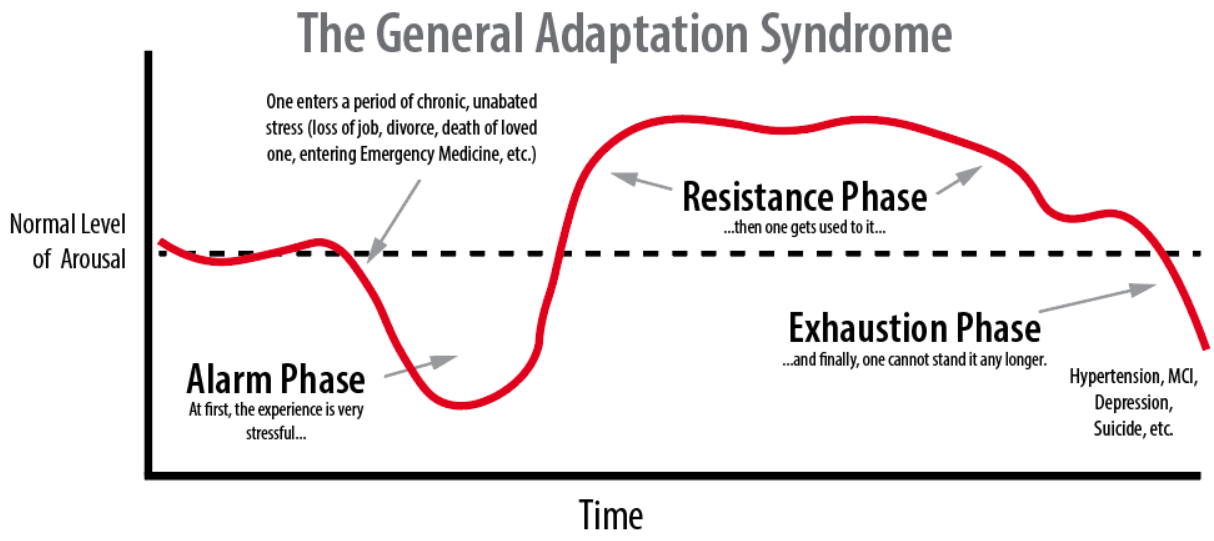

Image Credit: mcknightkaney.com

Hans Selye'র স্ট্রেসের এই থিওরি বেশ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে যায়। তার লেখা "The Stress of Life", "Stress Without Distress" বইগুলো সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এরফলে, মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনা যেমন, বসের সাথে তর্ক হওয়াকেও স্ট্রেস হিসেবে বর্ণণা করা, তার সাথে আসলে Hans Selye স্ট্রেসের যে তীব্রতার কথা বলেছিলেন তার তেমন কোন সম্পর্কই নেই। আবার অনেকে Stress কে distress বা মর্মপীড়া, বেদনার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। এমনকি অভিধানেও স্ট্রেসকে "শারীরিক, মানসিক বা আবেগীয় ধকল বা চিন্তা" হিসেবে বর্ণণা করা হয়, যা স্ট্রেসকে পুরোপুরি নেতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। অথচ Hans Selye নিজেও বলেছেন যে, অল্প পরিমাণে স্ট্রেস মানুষকে আরও ভালোভাবে কাজ করার প্রেরণা দেয়, এটিকে তিনি Eustress হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

Hans Selye সারাজীবনই স্ট্রেসকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়ন করতে, তার প্রাণীর উপর করা গবেষণার সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। স্ট্রেস নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি International Institute of Stress ও Hans Selye Foundation প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরও শেষ বয়সে সাংবাদিকরা তাকে স্ট্রেস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "সবাই জানে স্ট্রেস কি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কেউই জানে না।"

Father of Stress Research হিসেবে পরিচিত Hans Selye ১৯৮২ সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন।

7. Stress During Pregnancy

গর্ভাবস্থায় মা স্ট্রেসে থাকলে তা বাচ্চার জন্য খুবই ক্ষতিকর, এতে বাচ্চার সময়ের আগেই জন্ম হতে পারে বা বাচ্চার ওজন কম হতে পারে – এমন অনেক তথ্যই আমরা শুনি। এসব তথ্য ভুল না হলেও এখানে একটা ফাঁকি আছে। সেটা হল, এখানে "স্ট্রেস" বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা আমরা সাধারণত তলিয়ে দেখি না। আমরা ধরেই নেই যে, আমরা যে বিষয়টা নিয়ে স্ট্রেস অনুভব করছি, গবেষণাতেও সেই একই ধরণের স্ট্রেসের ক্ষতিকর প্রভাবই পাওয়া গেছে। কিন্তু আসলে বিষয়টা এমন নয়।

স্ট্রেস গর্ভবতী মায়ের জন্য ক্ষতিকর হবে যদি সেটা উচ্চমাত্রার হয় এবং লম্বা সময় ধরে থাকে। উচ্চমাত্রার স্ট্রেস যেসব ঘটনার জন্য হতে পারে তা হল-

- তীব্র নেতিবাচক ঘটনা, যেমন, বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিবারের কারো ভয়ানক অসুস্থতা বা মৃত্যু, চাকরি বা ঘরবাড়ি হারিয়ে অসহায় হয়ে পরা
- মারাত্মক দুর্ঘটনা, যেমন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, সন্ত্রাসী হামলায় জীবন তছনছ হয়ে যাওয়া
- লম্বা সময় ধরে চলা প্রবল সমস্যা, যেমন, স্বামী দ্বারা শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতিত হওয়া, প্রচণ্ড অর্থসংকটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়া
- নিয়মিত জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হওয়া, অপরাধপ্রবণ বা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় বসবাসের কারণে সারাক্ষণ আতঙ্কিত থাকা

এই উদাহরণগুলো দেখে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা সচরাচর যেসব বিষয় নিয়ে স্ট্রেস অনুভব করি, যেমন, অফিস প্রজেক্টের সময়সীমা কিংবা জীবনসঙ্গীর সাথে সামান্য মনোমালিন্য, এসব থেকে লম্বা সময় ধরে উচ্চ মাত্রায় স্ট্রেসে থাকার সম্ভাবনা কম। আর অল্প সময়ের জন্য যদি মা তীব্র মাত্রার স্ট্রেসেও থাকে, তাতেও গর্ভের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

আবার সবসময় যে সরাসরি স্ট্রেসের কারণেই গর্ভবতী মায়ের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিষয়টা এমনও নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্ট্রেসের কারণে মা নিয়মিত খাবার খায় না, ধূমপান, মদ্যপান করে কিংবা ঘুমের ওষুধ সেবন করে, যেসবের জন্য মূলত বাচ্চার ক্ষতি হয়। এখানে স্ট্রেসের চেয়ে, ওই ব্যক্তির স্ট্রেসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বা স্ট্রেস সামলানোর জন্য নেয়া পদক্ষেপ বেশি দায়ী।

আবার, যাদের আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাদের গর্ভাবস্থায় Preeclampsia হবার সম্ভাবনা বেশি। Preeclampsia এমন একটি জটিলতা যেখানে গর্ভবতী মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যা অন্যান্য অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে সময়ের আগেই অপরিণত বাচ্চা জন্ম হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র গর্ভাবস্থার স্ট্রেসের কারণে কিন্তু Preeclampsia হয় না। স্ট্রেসের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য মায়ের রক্তচাপ বাড়তে পারে, কিন্তু শুধুই স্ট্রেসের কারণে লম্বা সময় ধরে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে সে ব্যক্তি Preeclampsia এ আক্রান্ত হয়ে গেছে, বিষয়টা এমন নয়; এখানে তার পূর্ববর্তী শারীরিক অবস্থাও দায়ী।

গর্ভাবস্থায় নানান শারীরিক পরিবর্তন, হরমোনের তারতম্যের জন্য গর্ভবতী নারীর মানসিক অবস্থাতেও নানান অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এসময় তার বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে গর্ভাবস্থায় কোন কাজই করা উচিত নয়, সারাক্ষণ বিশ্রাম নেয়া উচিত বিষয়টা এমনও নয়। গর্ভাবস্থায়ও কেউ চাইলে তার চাকরি কিংবা বাসার স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যেতে পারেন। এসব কাজে যতটুকু মানসিক চাপ নিতে হয়, তাতে গর্ভের বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

8. Self Control Checklist

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর self control বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অংশটিতে আপনার দক্ষতা কেমন তা বুঝতে এই চেকলিস্ট আপনাকে সাহায্য করবে। যত বেশি সংখ্যক বাক্য আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, আপনার দক্ষতা তত বেশি। যে অংশে এখনো ঘাটতি আছে বলে মনে করছেন, সে অংশে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন সম্ভব।

- আমি মনে করি যে, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে কোন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। ____
- ব্যর্থ হলে আমার মন খারাপ হয় ঠিকই, তবে তা পরবর্তীতে আরো ভালো করার শক্তিও যোগায়। ____
- আমি মনে করি যে, বড় কোন কাজের আগে স্ট্রেস অনুভব করি বলেই সে কাজে ভালো করার জন্য অনেক চেষ্টাও করি। ____
- জীবনে একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ আসবে এটাই স্বাভাবিক, তার মাঝেই যতটা সম্ভব ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে। ____
- আমি কোন বিপদে পড়লে কি কি ক্ষতি হবে এটা চিন্তা করার পাশাপাশি ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসার উপায় নিয়েও চিন্তা করি। ____
- আমার পক্ষে অন্যের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করা সম্ভব না; তাই আমি আমার দিক থেকে যতটুকু করা সম্ভব সেটার উপরেই জোর দেই। ____
- আমার কাজের প্রতিটি ছোট ছোট ধাপ আমি সবসময় উপভোগ না করলেও, সামগ্রিকভাবে আমি কাজটা ভালোবাসি, তাই সবগুলো ধাপই মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করি। ____
- জীবনের কঠিন সময়গুলোতে আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি, তখন আমার এমন অনেক শক্তিশালী দিক প্রকাশ পায়, যা সম্পর্কে আমি নিজেও জানতাম না। ____

The Social Arts

9. Rule 7-38-55: non-verbal communication

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক Albert Mehrabian ১৯৬০ সাল থেকে মানুষের যোগাযোগের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তাকে এই গবেষণা ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক ধরা হয়। তিনি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তার Silent Messages বইয়ে প্রথম 7-38-55 Rule এর কথা বলেন।

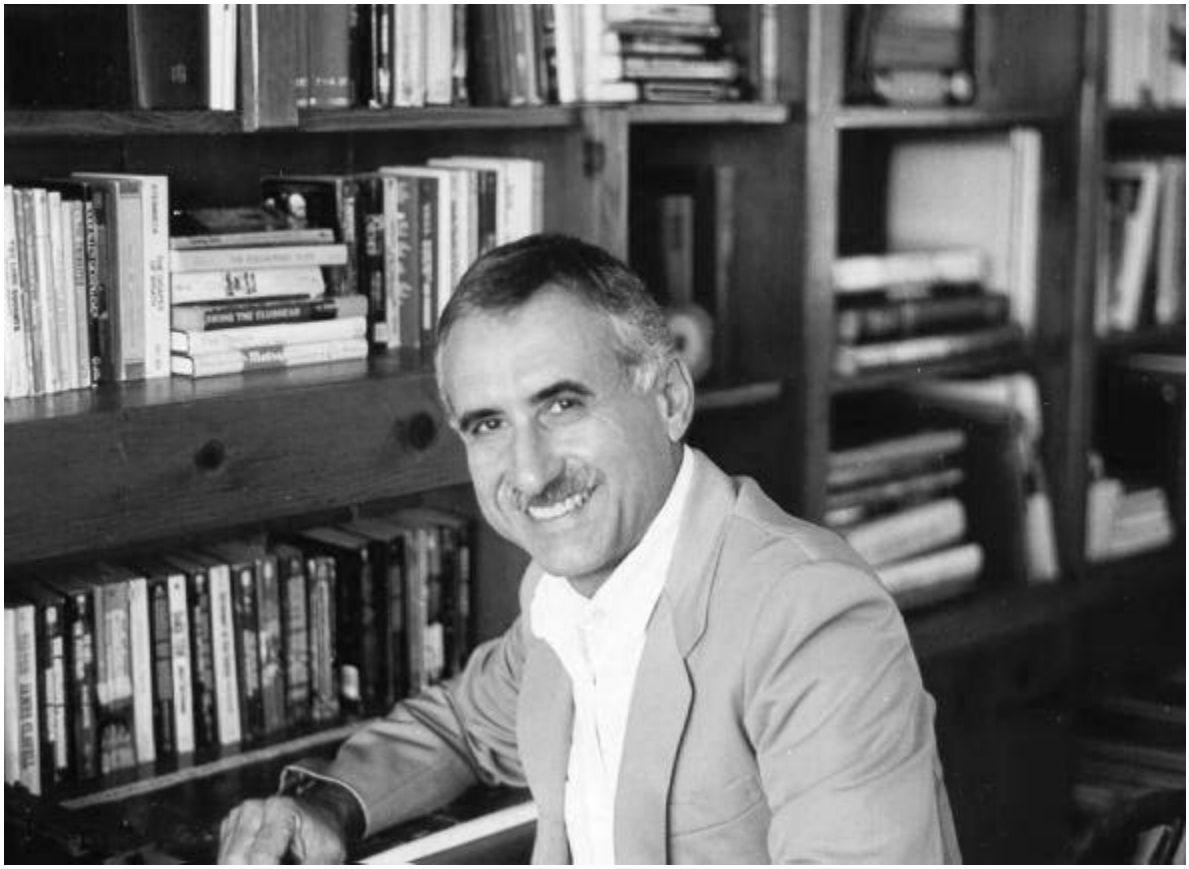

এই “7-38-55” দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আমরা কারো কাছে আমাদের আবেগ, মনোভাব প্রকাশের সময় ৭% শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি, ৩৮% গলার স্বরের ওঠা-নামা, বলার ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করি ও ৫৫% মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করি। অর্থাৎ, আমাদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে আসলে কথা বা শব্দের চেয়ে, Non verbal cue বা মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, গলার স্বর এসবের প্রাধান্যই বেশি। আমাদের মনোভাবের ৯৩% ই (৫৫%+৩৮%) এই Non verbal cue দ্বারা প্রকাশিত হয়।

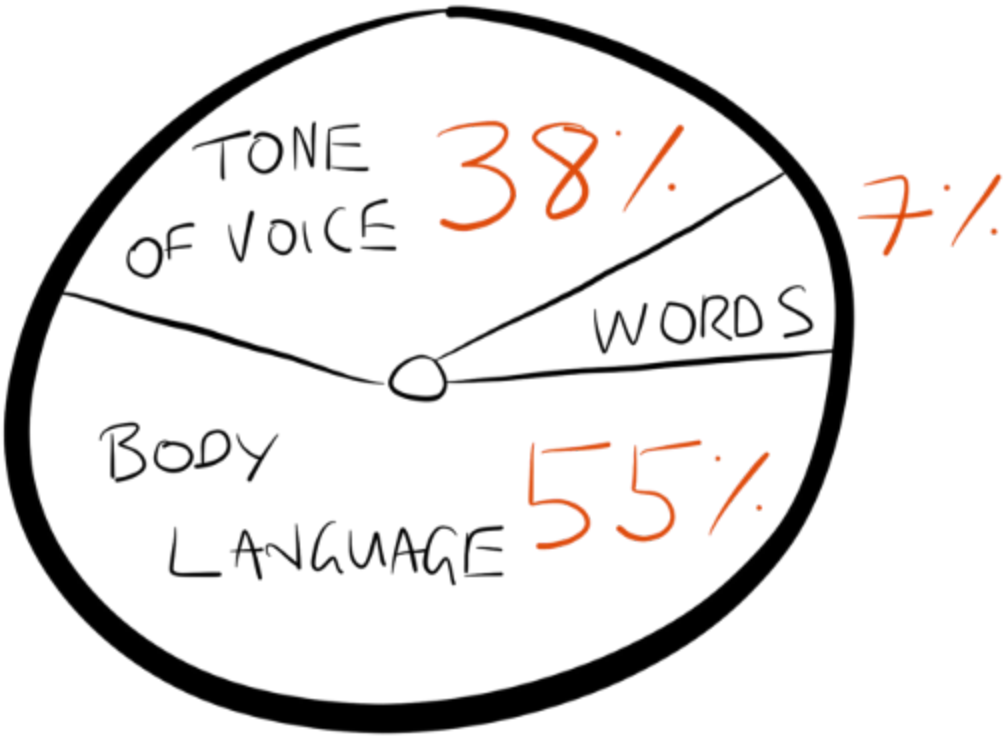

ধারণা করা হয়, ভাষা আবিষ্কারের আগে, এমনকি গলার স্বর পুরোপুরি বিকশিত হবার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত, সেজন্যই এর প্রবল প্রভাব আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। গবেষকদের মতে, যেহেতু আমাদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে non verbal cues এর প্রাধান্য অনেক বেশি, তাই কারো মুখের কথা ও non verbal cues এর মধ্যে মিল পাওয়া না গেলে, আমাদের non verbal cues এর উপরেই জোর দেয়া উচিত।

যেমন, আপনি কারো সাথে কথা বলার আগে জিজ্ঞেস করে নিলেন যে, সে ব্যস্ত কিনা কিংবা এখন কথা বলার সময় হবে কিনা। সে ব্যক্তি মুখে বলল যে, হ্যাঁ কথা বলেন, সমস্যা নাই। কিন্তু কথা শুরু করার পরে দেখলেন যে, সে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, উশখুশ করছে। এমন অবস্থায় এটা ধরে নেয়াই ভালো যে, ওই ব্যক্তির আসলে কথা বলার সময় নাই কিন্তু সে ভদ্রতাবশত আপনার মুখের উপর না করতে পারছে না। অর্থাৎ, তার মুখের কথা বা verbal communication এর চেয়ে non verbal cues বা অন্যান্য ইশারা, শারীরিক ভঙ্গি লক্ষ্য করলেই বরং তার প্রকৃত মনোভাব বোঝা সহজ হবে।

আবার কারো verbal ও non verbal cue মিলে গেলে তার বক্তব্য আরো স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন, আগের উদাহরণের ব্যক্তি যদি কথা শুরু করার পর আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনত, মাথা নেড়ে সম্মতি দিত, শান্তভাবে বসে থাকত, তাহলে আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতেন যে, ওই ব্যক্তি সত্যিই আপনার কথা শুনছে।

10. Golden Rule: I = You

"Do unto others as you would have them do unto you"

Mattew 7:12, Bible

এর ইংরেজি অনুবাদ, "**One should treat others as one would like others to treat oneself"**। অর্থাৎ, অন্যের সাথে আমাদের তেমন ব্যবহার করা উচিত, যেমন ব্যবহার আমি তাদের কাছ থেকে আশা করি। এই উক্তিটি সরাসরি বাইবেল থেকে নেয়া হলেও অন্যান্য ধর্মেও অন্যের প্রতি এ ধরণের আচরণ করার কথা বলা হয়েছে। অনেক দার্শনিক, মনীষীগণও এ ধরণের মনোভাবকে উৎসাহিত করেছেন।

গোল্ডেন রুল দ্বারা মানুষের প্রতি করা ইতিবাচক ও নেতিবাচক, দুই ধরণের আচরণকেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, আপনি যদি চান যে, অন্যরা আপনাকে সম্মান করুক, তাহলে আপনারও উচিত অন্যদের সম্মান করা। অন্যদিকে, আপনি যদি না চান যে, কেউ আপনার বদনাম করুক, তাহলে আপনারও আরেকজনের বদনাম করা উচিত না। আবার গোল্ডেন রুলকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয় যে, আপনি অন্যের প্রতি যেমন আচরণ করবেন, প্রতিদানে আপনি নিজেও তেমন আচরণই পাবেন। অর্থাৎ, আপনি কারো ক্ষতি করলে, অন্য কেউও আপনার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু আপনি নি:স্বার্থভাবে অন্যের উপকার করলে, আপনার বিপদেও কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে।

বিভিন্ন ধর্মে, সংস্কৃতিতে এ ধারণা প্রচলিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে এটি বেশ সমালোচিতও হয়েছে। সমালোচকদের প্রধান যুক্তি হল, আমি যেমন আচরণ পেতে পছন্দ করি, অন্যেরা তা পছন্দ নাও করতে পারে। আবার, অন্যেরা এমন কোন আচরণ প্রত্যাশা করতে পারে, যা আমি নিজের জন্য আশা করি না।

এছাড়াও, গোল্ডেন রুলের প্রয়োগ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত করতে পারে। যেমন, একটি ছেলে একটি মেয়ের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করছে, কারণ সেও মেয়েটির ভালোবাসা পেতে চায়। অথচ মেয়েটি তাকে ভালো না বাসলে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেজন্য জর্জ বার্নাড শ কৌতুক করেই বলেছেন, “Do not do unto others as you would have them do unto you. Their tastes may not be the same.”

তবে, কিছু পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা জটিল বলে যে আমরা গোল্ডেন রুলকে বাতিল করে দিব, বিষয়টা এমন না। এটিকে যদি আমরা কোন পরম সত্য বা কঠোর নিয়ম হিসেবে সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা না করে, মানুষের উপকারের স্বার্থে তৈরি কোন সাধারণ নিয়ম বা প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে দেখি ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তাহলে এই নিয়মটি অধিক কার্যকরী হবে। যেমন, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে, মানুষের প্রতি দয়া-মায়া পূর্ণ আচরণ করতে, গোল্ডেন রুল আমাদের সাহায্য করতে পারে।

11. Platinum Rule: You = You

ডেল কার্নেগী তার ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত How to Win Friends and Influence People বইয়ে একটি গল্প বলেছেন। গল্পটি এমন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে স্ট্রবেরি আর ক্রিম খুব পছন্দ করি। কিন্তু আমি দেখলাম, কোন এক অদ্ভুত কারণে, মাছেরা পোকা

খেতে পছন্দ করে। তাই যখন আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, আমি কিন্তু এটা ভাবিনি যে, আমি কি পছন্দ করি। বরং, আমি এটা ভেবেছি যে, মাছেরা কি পছন্দ করে। আমি বড়শিতে স্ট্রবেরি আর ক্রিম গাঁথিনি, পোকা বা ঘাসফড়িঙ গেঁথে মাছেদের বলেছি, 'তুমি কি এটা খেতে চাও?'"

এভাবে এ বইতে প্লাটিনাম রুলের ধারণা পাওয়া গেলেও এর আলাদা নামকরণ হয়নি। ১৯৭৯ সালে Milton J. Bennett তার

Overcoming the Golden Rule: Sympathy and Empathy

শীর্ষক গবেষণা পত্রে প্রথম প্লাটিনাম রুল হিসেবে "Do unto others as they themselves would have done unto them"- এর উল্লেখ করেন।

পরবর্তীতে, ১৯৯৬ সালে Tony Alessandra ও Michael O'Conner, **The Platinum Rule** নামে একটি বই লিখেন।

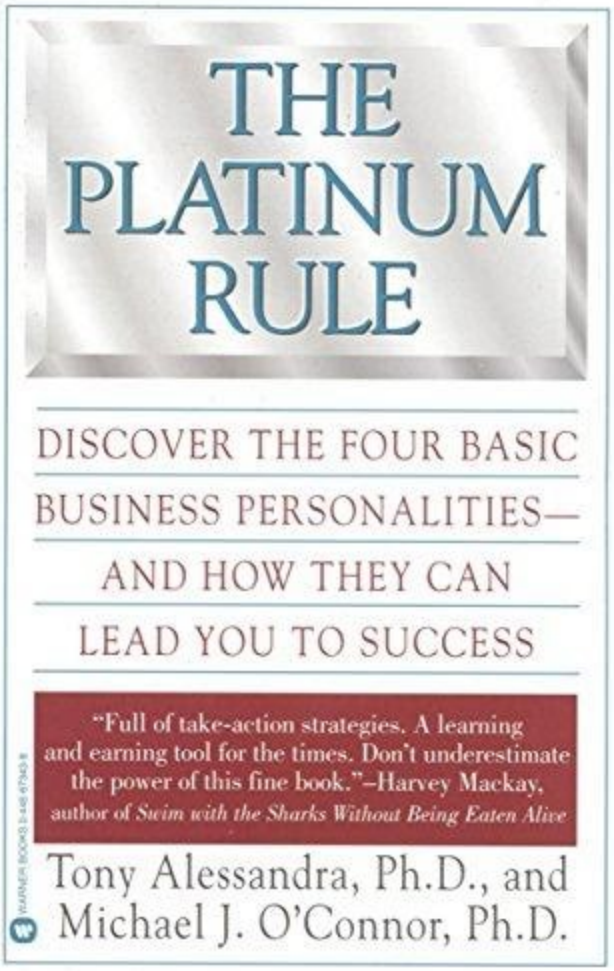

তারা সবাই মতামত দেন যে, গোল্ডেন রুল সবক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির প্রতি আচরণ নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় নয়। তাই তারা এর পরিবর্তে প্লাটিনাম রুলের প্রস্তাব করেন, যার মূল কথা হল, অপরের প্রতি তেমন আচরণ করা উচিত, যেমনটা সে প্রত্যাশা করে।

ধরা যাক, আপনি কফি খুব পছন্দ করেন। কেউ আপনার ক্লাস লেকচার ফটোকপি করার বিনিময়ে আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়ালেই আপনি খুশি হয়ে যান। কিন্তু যে কফি পছন্দ করে না, তাকে আপনি এক দিনের ক্লাস নোটের জন্য এক বয়াম কফি কিনে দিলেও সে খুশি হবে কি? হবে না। এখানেই গোল্ডেন রুলের চেয়ে প্লাটিনাম রুলের গুরুত্ব বেশি।

প্লাটিনাম রুল আপনাকে ব্যক্তিভেদে আরো যথোপযোগী আচরণের মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

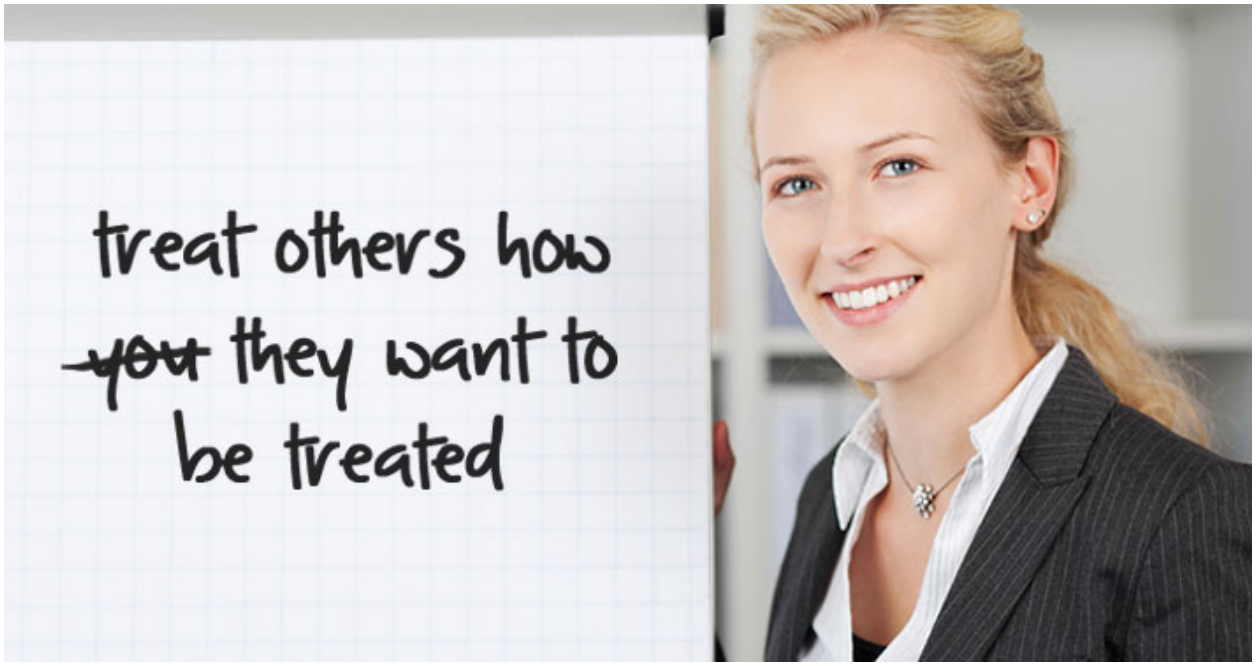

যে কম কথার মানুষ তার সাথে কথা বলার সময় যদি আপনিও ব্যক্তিগত আলাপ না জুড়ে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, সে খুশি হবে। আবার যে খুব মিশুক, তার সাথে আগে কিছুক্ষণ গল্প করে, একটা সম্পর্ক গড়ে তুলে, তারপর কাজের কথা বললে সে বেশি আগ্রহী হবে। একেক মানুষের জামা-কাপড়ের মাপ যেমন একেকরকম হয়, তেমনি তাদের শেখার, কথা বলার, কাজ করার ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেউ বই পড়তে পছন্দ করে, কেউ মুভি দেখতে; কেউ চাকরিতে বেতন বৃদ্ধি চায়, কেউ স্বীকৃতি; কেউ সরাসরি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তো কেউ ইমেইলে। এভাবে কে কি চায়, কি পছন্দ করে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তার প্রতি সুবিচার করা হবে।

তবে প্লাটিনাম রুলও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ধরা যাক, কেউ একজন চুরি করে ধরা পড়ল। এখন তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি চুরির দায়ে জেলে যেতে চাও? সে হয়ত বলবে, না। এখন সে জেলে যেতে চায় না বলেই কি আপনি তাকে পুলিশের হাতে না তুলে দিয়ে ছেড়ে দিবেন? নিশ্চয় না! দেশের আইন অনুযায়ী বা আপনার বিবেক অনুযায়ীও আপনি মনে

করেন যে, মানুষের অপকর্মের শাস্তি তার পাওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আর তাহলে প্লাটিনাম রুল প্রয়োগের সুযোগ থাকছে না।

তবে এমন কিছু বিতর্কিত ক্ষেত্রে প্লাটিনাম রুল ব্যবহার করা যায় না মানেই এই না যে এই রুলের কোন মূল্য নেই। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্ম, যোগাযোগ, সম্পর্কে আরও উন্নতি করতে প্লাটিনাম রুলের জুড়ি নেই।

12. Awareness of Others – Checklist

অন্যের প্রতি আপনি কতটা সচেতন, তা বুঝতে আপনাকে নিচের চেকলিস্ট টি সাহায্য করবে। কারো সাথে কথা বলার পর নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করে দেখতে পারেন যে, আপনি অন্য ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি কতটা সচেতন। যত বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে "হ্যাঁ" হবে, আপনার সচেতনতার মাত্রা তত বেশি।

যেসব প্রশ্নের উত্তর "না" হবে, সেসব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আরও যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আমি কি –

- মনোযোগ দিয়ে, আগ্রহ সহকারে অপর ব্যক্তির কথা শুনেছি? ____
- সরাসরি অপর ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে কথা শুনেছি? ____
- মনে মনে কথার উত্তর না ভেবে, আগে সে কি বলছে তা শুনেছি? ____
- তার মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি কে সম্মান ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি? ____
- তার মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বরের উঠা-নামা খেয়াল করেছি? ____
- তাকে বোঝাতে পেরেছি যে, আমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছি? ____
- তার অনুভূতি, প্রয়োজন বুঝতে পেরেছি? ____
- তার অবস্থা ভালোভাবে বোঝার জন্য কিংবা প্রয়োজন নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করেছি? ____
- চেষ্টা করেছি যেন আমার কোন কথা বা কাজে তার মনে আঘাত না লাগে? ___

Managing Relationships

13. Economist or Psychologist?

Daniel Kahneman এর জন্ম ১৯৩৪ সালে তেল আবিবে (বর্তমান ইসরাইল)। তার ছোটবেলা কেটেছে ফ্রান্স ও প্যালেস্টাইনে, নানা উত্থান পতনের মাঝে। কৈশোরে তিনি সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন, পড়ালেখা করেছেন জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন এবং ব্রিটিশ কলোম্বিয়া ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

১৯৬০ এর দশকে তিনি, মানুষ কিভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অর্থাৎ কিভাবে তথ্য বিচার-বিবেচনা করে সঠিক বিকল্প নির্বাচন করে – তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তার সঙ্গী ছিলেন Amos Tversky। তারা দুজনে 'অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ' এই বিষয়ে ১৯৭৯ সালে অর্থনীতির বিখ্যাত জার্নাল Econometrica'তে "Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk" শীর্ষক যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা অর্থনীতিতে 'Prospect Theory' নামে এক নতুন শাখার সূচণা করেছিল।

পূর্বে মনে করা হত যে, মানুষ অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যৌক্তিকভাবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা ও তা থেকে প্রত্যাশিত লাভের উপর ভিত্তি করে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু Daniel Kahneman তার গবেষণায় দেখান যে, যখন ভবিষ্যৎ খুব অনিশ্চিত, তখন মানুষ আসলে সম্ভাব্য জটিল ঘটনাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ না করেই এমন সব উপাদান বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, যা অর্থনীতিবিদরা সাধারণত হিসাব করেন না, যেমন – সেই সিদ্ধান্ত কতখানি ন্যায্য হবে, তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কি বলে কিংবা ক্ষতি কিভাবে এড়ানো যায়। Daniel Kahneman এও দেখেন যে, কোন ঘটনা কিভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে বা কিভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেও মানুষের সিদ্ধান্ত বদলে যেতে পারে! যেমন, যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, মনে করুন,

একটি ওষুধ কোন জটিল রোগাক্রান্ত ৮০% মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে আর অন্য একটি ওষুধ ২০% মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে না। এক্ষেত্রে আপনি কোন ওষুধটি ব্যবহার করবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশিরভাগ মানুষ প্রথম ওষুধটি গ্রহণ করে। অথচ, একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, দুইটি ওষুধের কার্যক্ষমতা আসলে একই। ৮০% মানুষ বাঁচার অর্থও কিন্তু বাকি ২০% মানুষের মৃত্যু হওয়া।

এখানে, মানুষের প্রথম উত্তরটি বাছাই করার কারণ হচ্ছে, মানুষ লাভ আর ক্ষতি দুইটি বিষয়কে দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। মানুষ লাভ করতে চায় আর ক্ষতি এড়াতে চায়। তাই গাণিতিকভাবে লাভ ও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সমান হলেও মানুষ লাভটাকেই বাছাই করে। এটাই Prospect Theory'র মূল কথা। এই থিওরি দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত আচরণও ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, মানুষ পণ্যের মূল্যে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয়ের আশায় যাতায়াতে অনেক বেশি অর্থ-সময় ব্যয় করে দূরের দোকানে কেনাকাটা করতে যায়। গাণিতিকভাবে এমন আচরণ অযৌক্তিক মনে হলেও অনেকেই এমন করে কারণ, তার কাছে পণ্য ক্রয়ে লাভটাই মূল কথা। মানুষ যে শুধু দৈনন্দিন জীবনে লাভকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা না, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের সামনেও যদি দুইটা শেয়ারকে উপরের ওষুধের প্রশ্নের মত করে উপস্থাপন করা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, তারা যে শেয়ারে লাভের কথা বলা হয়েছে সেটাতেই বিনিয়োগ করছে।

এভাবে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার অভূতপূর্ব গবেষণার জন্য Daniel Kahneman ২০০২ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। দু:খজনকভাবে ১৯৯৬ সালে Amos Tversky'র মৃত্যু হওয়ায় তিনি এ পুরষ্কার লাভ করতে পারেননি। পুরষ্কার জয়ের ঘোষণা আসার পর তাই Kahneman বলেন, "Certainly we would have gotten this together. There is that shadow over the joy I feel".

Image Credit: www.note.com

14. Thinking Fast and Slow

অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী মনোবিজ্ঞানী Daniel Kahneman ২০১১ সালে Thinking Fast and Slow নামে একটি বই প্রকাশ করেন যা, ২ মিলিয়নের বেশি কপি বিক্রি হয়েছে এবং এটি নিউ ইয়র্ক টাইমস ও দ্যা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতে, ২০১১ সালের সেরা দশটি বইয়ের মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এই বইতে তিনি প্রথম মানুষের চিন্তাভাবনার দুইটি পদ্ধতি – সিস্টেম ওয়ান ও সিস্টেম টু সম্পর্কে বলেন।

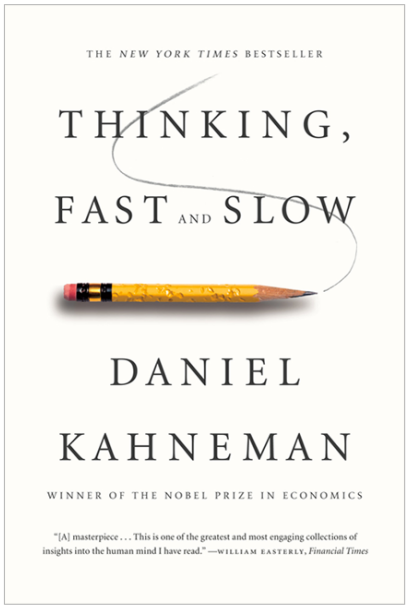

সিস্টেম ওয়ান হল “Fast Thinking”, অর্থাৎ, আমরা যখন কোন খুব দ্রুত, স্বত:স্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখাই, সেটা হচ্ছে সিস্টেম ওয়ান। আর, সিস্টেম টু হল “Slow Thinking”, অর্থাৎ ধীরেসুস্থে, বিচার বিবেচনা করে প্রতিক্রিয়া দেখালে, সেটা হবে সিস্টেম টু। যেমন, রাস্তা পার হতে গিয়ে সামনে একটা গাড়ি চলে আসলে কিন্তু আমরা খুব দ্রুত, মুহুর্তের মধ্য সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমরা সিস্টেম ওয়ান অনুসরণ করছি, যা আবহমান কাল ধরে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং আমরা বেঁচে থাকার জন্য তা অনুসরণ করে আসছি। আর যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ১৭৫X২৪২ কত, আপনি কি মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিতে পারবেন? না, সাধারণ মানুষের এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে, প্রয়োজনে কাগজকলম নিয়ে উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করব সিস্টেম টু, যা বিবর্তনের ধারায় মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের চিন্তাধারায় সংযুক্ত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন চলে আসে যে, আমরা কি শুধু বাঁচা – মরার প্রশ্নে সিস্টেম ওয়ান আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সিস্টেম টু অনুসরণ করি? না!

আমরা আসলে সব ক্ষেত্রেই প্রথমে সিস্টেম ওয়ান অনুসরণ করার চেষ্টা করি। যেমন, আপনাকে প্রশ্ন করা হল,

একটি ব্যাট ও বলের মূল্য একত্রে ১ টাকা ১০ পয়সা। ব্যাটের মূল্য বলের চেয়ে ১ টাকা বেশি। তাহলে বলের মূল্য কত?

প্রশ্নটি আগে শুনে না থাকলে মানুষ সাধারণত চট করে উত্তর দেয়, বলের মূল্য ১০ পয়সা। কারণ আপাতদৃষ্টিতে এটাকেই সঠিক উত্তর বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, যদি –

বলের মূল্য হয় ১০ পয়সা,

তবে, ব্যাটের মূল্য হবে ১০ পয়সা+ ১ টাকা = ১ টাকা ১০ পয়সা

সেক্ষেত্রে, ব্যাট ও বলের মূল্য একত্রে দাঁড়ায় ১০ পয়সা+১ টাকা ১০ পয়সা = ১ টাকা ২০ পয়সা!

অর্থাৎ, বলের মূল্য আসলে ১০ পয়সা নয়, বলের মূল্য হবে ৫ পয়সা। কারণ-

বলের মূল্য ৫ পয়সা

তবে, ব্যাটের মূল্য (৫ পয়সা+ ১ টাকা) বা ১ টাকা ৫ পয়সা

অতএব, ব্যাট ও বলের মূল্য একত্রে ৫ পয়সা+১ টাকা ৫ পয়সা = ১ টাকা ১০ পয়সা

এটা এমন কোন কঠিন অংক নয়, তারপরও আমরা যেন অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চট করে প্রথম দেখায় যেটা মাথায় আসে, সেই উত্তরটাই দেই।

এর কারণ হচ্ছে, আমাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে যে পথে কম শক্তি ব্যয় হবে বা কম বাঁধা আসবে, সেই পথটাই গ্রহণ করে। একে Principle of Least Effort বলা হয়। এটা দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা এভাবে মস্তিষ্ক শক্তি সংরক্ষণের চেষ্টা করে। যেহেতু, মস্তিষ্ক একাই আমাদের শ্বাসের সাহায্যে গ্রহণ করা ২৫% অক্সিজেন ব্যবহার করে,

তাই সে সবসময় কিভাবে শক্তি বাঁচানো যায় সে চেষ্টা করে। আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা অভ্যাসবশত করা আচরণ হল শক্তি বাঁচানোর প্রধান উপায়।

আমাদের মস্তিষ্ক সিস্টেম ওয়ানের উপর বেশি নির্ভর করতে চায় তার অর্থ কিন্তু এই না যে, সিস্টেম টু অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না! এই যে আপনি আজকে সিস্টেম টু সম্পর্কে জানলেন, আপনার মস্তিষ্ক যে আসলে অলস, চিন্তাভাবনা করে শক্তি ব্যয় করতে চায় না, এই ব্যাপারে সচেতন হলেন, এটাই সিস্টেম টু ব্যবহারের প্রথম ধাপ। এখন থেকে যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ বা সংবেদনশীল কোন বিষয়ে আলোচনার সময় সজ্ঞানে প্রথমেই যা মুখে আসবে তা না বলে, চিন্তাভাবনা করে প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেষ্টা করেন, তাহলেই আপনার পক্ষে ধীরে ধীরে সিস্টেম টু তে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে।

সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, দিনের প্রতিটি কাজে কিন্তু সিস্টেম টু এর প্রয়োজন নেই। যেমন, সাইকেল চালানো বা জুতার ফিতা বাঁধা, এসবে কিন্তু আমরা সিস্টেম ওয়ান ব্যবহার করে থাকি, যা যথেষ্ট। তাই অপ্রয়োজনীয় বিষয়েও সিস্টেম টু মানতে গিয়ে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত শক্তি খরচ করারও প্রয়োজন নেই।

15. You or I

> “তুমি কোন কাজই করো না, সব কাজ আমাকেই করতে হয়!”
>
> “তুমি সবসময় দেরি করো! একটা দিনও সময়মত আসো না!
>
> “তুমি কাজে শুধু ভুল করো! তোমার ভুলের জন্যই আমি রাগ করি!”

কথাগুলো কি খুব পরিচিত লাগছে? আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সময়েই এধরণের কথা বলে থাকি। এগুলোকে বলা হয় “You Message/Satement“, কেননা এখানে অপরজনকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলা হচ্ছে। এই ধরণের কথায় আমরা সাধারণত অপরব্যক্তির কি ভুল হয়েছে, তার কি করা উচিত ছিল, এগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি, নিজের অনুভূতি বা নিজের উপর ওই ব্যক্তির কাজের প্রভাব নিয়ে কথা বলি না। সেজন্য কথাগুলো শুনলে অপরব্যক্তির মনে হতে পারে যে, আপনি তাকে একতরফাভাবে দোষারোপ করছেন, তার দিকটা আপনি দেখছেন না। আর নিজের দোষের বিচার আরেকজনের মুখে শুনতে কিন্তু কারোই ভালো লাগে না। তাই এ ধরণের কথা শুনলে সাধারণত অপরব্যক্তি রেগে যায় বা যে কথাগুলো বলছে উলটো তার দোষ বের করার চেষ্টা করে। এভাবে কিন্তু সুন্দর একটা কথোপকথন বা যোগাযোগের সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যায়।

সেজন্যই “I Message/Statement” ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন নিজের কথা, নিজের অনুভূতির কথা বলবেন, তখন এটা প্রকাশ পায় যে, আপনার জীবনের, আপনার অনুভূতির দায়িত্ব আপনার হাতেই আছে। আপনি যা বলছেন, তা নিজ দায়িত্বে বলছেন, অপরব্যক্তিকে দায়ী করছেন না। সেই সাথে, আপনি শুধু নিজের দিকটা বলা মানে আপনি অপর ব্যক্তির দিকটাও শুনতে চাচ্ছেন, সে কিছু বলার আগেই আপনি তারই দোষ- এমনটি ধরে নেননি। এরফলে, অপরব্যক্তিও আপনার কথায় অপমানিতবোধ করবে না বা রেগে যাবে না, বরং সেও তার দিকটা বলতে উৎসাহিত হবে। এভাবে একটা সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

এখানে একটা বিষয় জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, “You Message/Statement” এর আগে একটা “I” যুক্ত করে দিলেই কিন্তু সেটা “I Message/Statement” হয়ে যায় না! যেমন, যদি বলা হয় যে, ‘আমার মনে হয়, দোষটা তোমারই ছিল’ – তাহলে কি এটা “I Message/Statement” হবে? না! আমি দিয়ে শুরু হলেও এটা “I Statement” হবে না কারণ বাক্যটা আমি দিয়ে শুরু হলেও এখানে অপরব্যক্তিকেই দোষারোপ করা হয়েছে। এটাকে বলা হয়, ছদ্মবেশী “You Message/Statement” (You statement in disguise)। সুতরাং, আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, বাক্য “আমি” দিয়ে শুরু করাই যথেষ্ট নয়! বাক্যে নিজের অনুভূতি বা কাজের দায়িত্ব নেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

“I and You Message/Statement” এর পার্থক্য বোঝার সুবিধার্থে নিচে কিছু বাক্যের দুইটা রূপ পাশাপাশি উল্লেখ করা হল। এটি আপনাকে দৈনন্দিন জীবনে “I Message/Statement” ব্যবহার করতে সাহায্য করবে।

You Message/Statement	I Message/Statement
তোমার আমার দিকে কোন খেয়ালই নাই! তুমি কখনোই ফোন করে আমার খোঁজখবর নাও না!	অনেকক্ষণ তোমার ফোন না পেলে আমার খুব খারাপ লাগে, নিজেকে খুব একা মনে হয়।
তুমি ঘরের কোন কাজই করো না! সব কাজ আমাকেই করতে হয়!	একা একা ঘরের সব কাজ করতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি আজকে থালাবাসন ধুতে আমাকে সাহায্য করবে?

তুমি একদমই হিসাব করে টাকা খরচ করো না! টাকার ব্যাপারে এত উদাসীন হলে জীবন চলে?	একটা কাজে বাজেটের বাইরে টাকা খরচ হলে অন্যান্য সব কাজের জন্য টাকা কম পড়ে যায়, আমাকে সেসব কাজ করতে তখন হিমসিম খেতে হয়। তুমি কি আগামীবার বাজেটের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবে?
তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করো।	আমি তোমার কাছ থেকে আরও সম্মানজনক ও সুন্দর আচরণ আশা করি।

You Message/Statement	I Message/Statement
তুমি সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো, বাসায় একদম সময় দাও না।	যখন তুমি বাসায় আমার সাথে সময় কাটাও না, বিশেষ দিনগুলোতেও বাসায় থাকো না, আমার নিজেকে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হয়।
তুমি আমার কথা শোনো না! তুমি আমাকে বোঝোই না!	আমি মানা করার পরেও যখন তুমি সেই কাজটা করো, আমার মনে হয়, আমার কথার কোন গুরুত্ব নেই। আমি তখন হতাশ হয়ে যাই।

তোমার ভুলের জন্যই আমি রাগ করেছি।	আমার খুব রাগ লাগছে কারণ আমি যেভাবে আশা করেছিলাম, কাজটা সেভাবে হয়নি।
তুমি আমার সব ব্যাপারে নাক গলাও।	আমার বিষয়গুলোতে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চাই।

উদাহরণগুলো পড়ে হয়ত মনে হতে পারে যে, সবসময় এভাবে কথা বলা সম্ভব না! রাগের সময় এতকিছু মাথায় থাকে না! হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, এই লেখাটি পড়া মাত্রই আপনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে "I Message/Statement" ব্যবহার করা শুরু করে দিবেন, ব্যাপারটা এমন না। ভিডিও ও লেখাটি শুধুমাত্র আপনাকে এই ব্যাপারে সচেতন করবে, এভাবেও যে উত্তর দেয়া যায়, সেটা জানাবে।

এরপর ধীরে ধীরে অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার 'I Message/Statement'কে নিজের কথোপকথনের অংশে পরিণত করতে হবে। আপনি যার সাথে কথা বলছেন, সে যতই রেগে থাকুক না কেন, আপনি যদি তাকে দোষারোপ না করে, নিজের উপর দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন, তাকে কিছু করার অনুরোধ করেন, সেও কিন্তু আপনার দোষ দেয়ার আগে একবার ভাববে। এভাবে নিজেকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে অন্যের সাথে গড়ে তোলা সম্পর্কেও পরিবর্তন আনা সম্ভব।

16. Checklist for Building Relationship

অন্যের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এ অংশে Assertive Communication, সিস্টেম টু ব্যবহার করে সমালোচনার প্রতিক্রিয়া দেখানো ও অথেনটিক কানেকশন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কারো সাথে কথোপকথনের পর নিজেকে নিচের প্রশ্নগুলো করে বোঝার চেষ্টা করতে পারেন আপনার এ বিষয়ে দক্ষতা কতখানি। যত বেশি সংখ্যক

প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ হবে, আপনার দক্ষতা তত বেশি। যেসব প্রশ্নের উত্তর না হবে সেক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নতি করা সম্ভব।

আমি কি –

- ঢালাওভাবে দোষারোপ না করে, তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলেছি? _____
- অভিযোগ না করে আমার উপর তার আচরণের কি প্রভাব পড়ছে তা সঠিকভাবে উল্লেখ করেছি? _____
- আমি কি অন্যের দোষগুণ বিচার না করে, ‘I Statement’ ব্যবহার করে নিজের কথা বলেছি? _____
- আমি কি সমালোচনায় রেগে না গিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করেছি? _____
- আমি বিষয়, সময়, কারণ প্রভৃতি উল্লেখ করে সুনির্দিষ্টভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছি? _____
- অন্যান্য মানুষকে আদেশের চেয়ে অনুরোধ বেশি করি? _____
- কথার মাঝে নেতিবাচক বাক্যের চেয়ে ইতিবাচক বাক্য বেশি ব্যবহার করি? _____
- প্রশ্ন করে নিশ্চিত হই যে, অপর ব্যক্তিকে ভালোভাবে আমার বক্তব্য বোঝাতে পেরেছি কিনা? _____
- সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপরপক্ষের অনুভূতি-প্রয়োজনকে নিজের অনুভূতি ও প্রয়োজনের মত গুরুত্ব দেই? _____